নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃ: ১-১০
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে জৈবিক নৃবিজ্ঞানের পুনর্পাঠ

নাসরিন খন্দকার*

১. ভূমিকা

নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মানুষ। এটুকু বললে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে কোন মানুষ, কী জানার উদ্দেশ্যে এর বিষয়বস্তু হয়ে উঠে তার কার্যকারণ বোঝা যায় না। নৃবিজ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের সংজ্ঞায়ন ও এর সীমানা নিয়ে চিন্তিত। তাই নৃবিজ্ঞানের শৈশবে এর বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব পায় পশ্চিমা আধুনিক সমাজের মানুষ হতে ভিন্ন মানুষ ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে বলা যায় "মানুষের ভিন্নতার মধ্যকার ঐক্য অনুসন্ধানের সুসংগঠিত পাঠ" (স্টকিং ১৯৮৮, পৃ:৩)। অন্যদিকে মানুষকে বুঝতে গিয়ে মানুষ ও অন্য প্রাণির সীমানা, মানুষের উৎস, সেই উৎস হতে মানুষের মানুষ হয়ে উঠার ইতিহাস, মানুষের আকার-আকৃতিগত ভিন্নতা ইত্যাদি হয়ে উঠে দৈহিক/জৈবিক নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আগ্রহের বিষয়। জৈবিক নৃবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাথে স্বতন্ত্র ও বেশ বিচ্ছিন্ন অনুসন্ধানের কেন্দ্র হিসেবে বেড়ে উঠে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলোর নিকটবর্তী থেকে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া চালায়, অন্যদিকে জৈবিক নৃবিজ্ঞান অনেক বেশী কাছাকাছি হয়ে উঠে জীববিজ্ঞানের সাথে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে পুরু দেয়ালে বিচ্ছিন্ন জগৎ, জৈবিক নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যেও তেমনিভাবে গড়ে উঠে একটি দেয়াল।

সম্প্রতি বিজ্ঞানের শাখাগুলো সামাজিক বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠায় যেমনভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যকার সীমানা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট সামাজিক বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আগ্রহ যে নৃবিজ্ঞানীর রাজনৈতিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বিভিন্ন সমালোচনার মাধ্যমে আজ প্রতিষ্ঠিত। উপনিবেশিকতার সাথে এর যোগাযোগ, পশ্চিমি নৃবিজ্ঞানীর স্বজাতিকেন্দ্রিকতা, অন্যকরণ ইত্যাদি সমালোচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আপাত বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নের মুখে পড়লেও জৈবিক নৃবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ইতিহাস রাজনৈতিক সমালোচনা হতে দূরেই ছিল। খাঁটি বিজ্ঞানের শাখা জীববিজ্ঞানের সাথে এর সম্পৃক্তি একে বিজ্ঞানের মতই প্রশ্নহীন রেখেছে, এর কেন্দ্রীয় যোগ্যতা হিসেবে বস্তুনিষ্ঠতা এখানে সমালোচনার মুখে তেমন পড়েনি। কিন্তু বিজ্ঞানের, এমনকি খাঁটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যখন পশ্চিমা আধিপত্যবাদ, পুরুষতান্ত্রিকতার প্রশ্নের সামনে পড়ে তখন জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুও এর বাইরে থাকতে পারে না।

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: nasrin.khandokar@gmail.com

বিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণের পথ ধরে এই প্রবন্ধে আমি এক এক করে এগুবো জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত জৈবিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনায়। এই পথে তার আগে অবশ্য আসবে আধুনিক বিজ্ঞানের চরিত্র বিশ্লেষণ ও তার পুর্ণপাঠ। আসবে জৈবিক নৃবিজ্ঞান যে জীববৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা নির্মিত তার পুনর্মূল্যায়ন। আর এসব আলোচনাকে প্রেক্ষাপটে রেখে জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, এপ্রোচ এবং উপধারাগুলো চর্চার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উদ্দীপনা বিশ্লেষিত হবে।

২. বিজ্ঞান ও এর সামাজিক বিশ্লেষণ

বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন হতে জানা যায়, বৈজ্ঞানিক হতে গেলে জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে, জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে। তবেই এই জ্ঞান সর্বজনগ্রাহ্য, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হবে। কিন্তু এর বাইরে 'বিজ্ঞান' শব্দটি আমাদের মনজগতে কী কী অর্থে হাজির হয়? অপরিহার্যভাবে বিজ্ঞান এমন একটা মহান বয়ান হিসাবে মনে আসে যা বিদ্যমান সকল কিছুকে বৈধ না অবৈধ, গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তার সনদ দেবার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ধারণ করে। যে কোনো জ্ঞানজাগতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে আমরা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হই, জানতে চাই এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান কী বলে? বিজ্ঞানের অনুমোদন ছাড়া কোনো জ্ঞানই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আনুগত্য, আমাদের নির্ভরশীলতা প্রশ্নহীন। বিজ্ঞান সবজান্তা, বিজ্ঞান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, বিজ্ঞান সবচেয়ে বড় বিচারক।

কিন্তু বিজ্ঞান তো একটা বিশেষ বয়ান, এই বয়ান কি আপনাতেই তৈরি হয়? যেমনভাবে ধর্মগ্রন্থ নাজিল হয়? কে কিভাবে বৈজ্ঞানিক বয়ান তৈরি করে? উত্তর তো জানা, বিজ্ঞানীর কাজ হলো বিজ্ঞানের বয়ান তৈরি করা। মনোযোগ দেই তাহলে বিজ্ঞানীর দিকে। বিজ্ঞানী কে? কে বিজ্ঞানী আর কে নয়, তা কিভাবে বুঝবো? কিভাবে বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে হয় তা বিজ্ঞানের মহা বয়ানে দেয়া আছে, বিজ্ঞানী হতে গেলে প্রথমেই তাকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। একজন খাঁটি বিজ্ঞানীর অর্জন করতে হবে সার্বিক নৈব্যর্ক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞান চর্চায় বিজ্ঞানীকে হতে হবে মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ, অর্থ্যাৎ এক অর্থে মূল্যবোধ বিহীন। খাঁটি বিজ্ঞান হতে হলে তাকে নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে, ভালো-মন্দের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চলবে না, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কোন্ কাজে ব্যবহার করবে তা বিজ্ঞানের বিবেচ্য হবে না, এর কোনো বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ থাকা চলবে না ইত্যাদি। এগুলো বিজ্ঞানের একধরনের মিথ (চালর্সওয়ার্থ, ফ্যারেল, স্টকস, টার্নবুল ১৯৮৯)। এই মিথ আরো বলে যে বিজ্ঞানীর নিজস্ব আবেগ-অনুভুতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আচরণ, আশা-আকাঙ্খা তাদের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের সাথে সর্ম্পকহীন হতে হবে। এগুলো সবই এমন এক ধরনের মিথ যাকে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পশ্চিমা আধুনিক দর্শনের স্থপতিদের দ্বারা এই মিথ নির্মিত হয়। দেকার্ত বা হিউম প্রদত্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের বিভাজনের ধারণা এই মিথের ভিত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ (পুর্বোক্ত)।

কিন্তু বিজ্ঞানীর মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা যখন বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত তখনই বিজ্ঞান-বিজ্ঞানীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিমূর্ত মহাবয়ান হিসেবে বিজ্ঞানকে প্রশ্নহীন থাকতে দেয় না। কেননা

বিজ্ঞানীর মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানীর সাথে আর বিজ্ঞানীকে তার পরিপ্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত করে; যে পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক। মূলত উত্তরকাঠামোবাদী ও উত্তর-উপনিবেশিক ধারা হতেই বিজ্ঞানের মহাবয়ানের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দর্শন ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারাতে এই সমালোচনা নানান মাত্রায় বিকাশ লাভ করতে থাকে। বিজ্ঞানের অন্যতম সামালোচনার একটি হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের দর্শন ও পদ্ধতি মূলগতভাবেই সহিংসতার ভিত তৈরি করে বিজ্ঞানকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হতে মুক্ত করে দেবার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানী নৈতিকতার দায়বদ্ধতা হতে মুক্ত হন, কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্খা ও অন্যান্য ব্যক্তিক অনুভূতি দ্বারা তিনি সহিংস বিজ্ঞানের চর্চায় বাধাহীন হয়ে উঠেন (আলভারস ১৯৮৮ পৃ:৭০)। আবার আধুনিক বিজ্ঞান তার নির্ধারিত পন্থা ছাড়া অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে আহরিত জ্ঞানকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে একটি ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী জ্ঞান হয়ে উঠে (পূর্বোক্ত পৃ:৮৫)।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রিডাকশনিস্ট পদ্ধতি যেভাবে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থেকে প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করে তাকে বন্দনা শিবা (১৯৯৯) বাতিল করেন। তার মতে প্রথমতঃ একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে কিছু নেই। এটি অনেক পদ্ধতির সমাহার এবং বারেবারেই নবায়নযোগ্য, ফলে তা সর্বজনীন হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান সত্য উদ্ঘাটন করে সে সত্যের ধ্রুবত্ব দর্শনের ইতিহাস সমর্থন করে না। কেননা, এই সত্য সবসময়েই পরবর্তী সত্য দ্বারা বাতিলযোগ্য। তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রকৃতির খাঁটি সত্য বর্ণনা করে এটি সত্য নয়, কেননা প্রকৃতির কোনো সত্যই নিরপেক্ষ সত্য নয়, কে একে কিভাবে দেখছে তার উপরেই আপেক্ষিক সত্য নির্ভরশীল। শেষতঃ রিডাকশনিস্ট বিজ্ঞানের জ্ঞানদর্শন যেভাবে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত জ্ঞানের চর্চা দ্বারা সামগ্রিক জ্ঞানের দিকে যায়, একটি বিশেষ বিশেষজ্ঞদল প্রকৃতির একটি বিশেষ অংশকে অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে তা বৈজ্ঞানিক নয়, রাজনৈতিক (শিভা ১৯৯৯, পৃ:২৩৭)।

উত্তর-উপনিবেশবাদী ধারার বিজ্ঞানের প্রতি সমালোচনা তিনভাবে বহুসাংস্কৃতিক ও বৈশ্বিক নারীবাদী দর্শনকে সাহায্য করে। এক, এই ধারা বিভিন্ন অপশ্চিমা সমাজের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা তুলে ধরে। দুই, ইতিহাসের পরিক্রমায় পশ্চিমা এবং অপশ্চিমা সমাজের ঐতিহাসিক সম্পর্কের পরিবর্তনে স্থাপন করে। তিন, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করে (হার্ডিং ১৯৯৬ পৃ:২৬৬)।

উত্তর-উপনিবেশিক আলোচনার সূত্র ধরে নারীবাদী দর্শন হতে আধুনিক বিজ্ঞানের পুরুষতান্ত্রিকতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই সমালোচনা মতে, আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বজনীন, মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক সত্যের প্রতি ঝোঁক পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারা উৎপাদিত। জ্ঞান এমন একটি সামাজিক ক্রিয়া যা বিশেষ সংস্কৃতি এবং বিশ্ববীক্ষা দ্বারা নির্মিত। প্রকৃতি-সংস্কৃতির দ্বিবিভাজনের পশ্চিমা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান নারীকে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও যৌক্তিকতায় অক্ষম হিসেবে শুধু যে পুরুষালি বিজ্ঞান হতে বহিষ্কার করে তাই-ই না, সেই সাথে বিজ্ঞানকে একটি পুরুষালি লিঙ্গবাদী স্বপ্ন হিসেবে হাজির করে; যে স্বপ্ন প্রকৃতিকে অনাবৃত, খন্ডে খন্ডে বিভক্ত, বিদ্ধ এবং আধিপত্য কায়েম করতে চায় (এসলা : ১৮৮৯)।

পুরুষতান্ত্রিক বিজ্ঞানের বিপরীতে শক্তিশালী সমালোচনা এবং বিকল্প সম্ভাবনা উঠে আসে স্ট্যান্ডপয়েন্ট নারীবাদী দর্শন হতে। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারা মতে কোনো জ্ঞানই মুল্যবোধ-নিরপেক্ষ নয়। বরং নিজ নিজ অবস্থান হতে মানুষ যেভাবে বিশ্বকে বুঝে নেয় তাই-ই তার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান। এই জ্ঞান আংশিক এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বজনীন নির্মিত বয়ানকে বাতিল করে। তারা দেখান বিশেষভাবে পুরুষালি অভিজ্ঞতা হতে উঠে আসা পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গিকেই দর্শন, প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানে নৈর্ব্যক্তিক ও লিঙ্গ নিরপেক্ষ জ্ঞান মনে করা হয়েছে। স্যান্ড্রা হার্ডিং এর মতে মুল্যবোধ নিরপেক্ষ হয়ে উঠার মধ্যদিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা সম্ভব নয়। এটাকে তিনি 'দুর্বল বস্তুনিষ্ঠতা' (weak objectivity) বলেন। বরং স্ট্যান্ডপয়েন্ট নারীবাদীরা 'শক্তিশালী বস্তুনিষ্ঠতা' (strong objectivity) অর্জন করতে চান ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা দিয়ে। যদিও এই আপেক্ষিকতা মুল্যবোধ বিচার অর্থে নয় (স্ট্যান্ডিং ১৪২)। স্ট্যান্ডিং এর মতে প্রান্তিক অভিজ্ঞতা হতে উঠে আসা জ্ঞান আধিপত্যশীল মহাবয়ান হতে অনেক বেশী বস্তুনিষ্ঠ। এই ধারার মতে সমস্ত জ্ঞান সামাজিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ধারার আরেক প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ডোনা হারাওয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন আরো তীব্রভাবে। তার মতে সমস্ত জ্ঞানই প্রোথিত (situated)। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথাগত বস্তুনিষ্ঠতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি কিভাবে জ্ঞান নির্মিত হয় তা বুঝতে বিপথগামী করে। সান্ড্রা হার্ডিং এর বিজ্ঞানে নারী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হারাওয়ে বলেন, বিজ্ঞান হচ্ছে একটি প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ক্ষমতার ক্ষেত্র। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্য অনুসন্ধানের এজেন্ডাকে বাতিল করে দেন। কেননা, তার মতে আধুনিক বিজ্ঞান পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ পুরুষতান্ত্রিক আগ্রহ দ্বারা বোনা। লিঙ্গ, বর্ণ, যৌনতা, জাতি, পরিবার, শ্রেণীর ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানকে নির্মাণ করেছে। বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার ধারণা তাই অবান্তর। এমনকি সান্ড্রা হার্ডিং এর স্ট্যান্ডপয়েন্ট হতে নির্মিত জ্ঞানকেও তিনি বস্তুনিষ্ঠ বলবেন না, বলবেন অন্য যে কোনো জ্ঞানের মতই তা প্রোথিত (situated), আংশিক, গল্প। তিনি সত্য ও গল্পকথার প্রথাগত বিভাজন ভেঙ্গে দেন। তার কাছে এই দুই একই জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে বেড়ে উঠে। সত্য আবিস্কারের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা তার কাছে একটি গল্প বলার প্রচেষ্টা (হারাওয়ে : ১৯৮৯ পৃ:৪)।

বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা ও আপাতঃ মুল্যবোধ নিরপেক্ষতার প্রতি এ সকল প্রশ্ন বিজ্ঞানের প্রশ্নহীন ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। এই পরিপেক্ষিতে খাঁটি/প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখা জীববিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠা জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতাকে পূনর্বিশ্লেষণের অবকাশ তৈরি হয়।

৩. জৈবিক নৃবিজ্ঞানের জীববৈজ্ঞানিক পাটাতন

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার পূর্বশর্ত খাঁটি বিজ্ঞানের মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা। প্রাকৃতিক 'খাঁটি/শক্তপোক্ত' বিজ্ঞানের বিপরীতে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব-পদ্ধতি 'নরম', মুল্যবোধ নিরপেক্ষ না হলেও চলে, সাবজেক্টিভিটির দোষে দুষ্ট হলেও সমস্যা নেই (চালর্সওয়ার্থ, ফ্যারেল, স্টকস, টার্নবুল : ১৯৮৯)। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানের চর্চা হতে হবে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ। সামাজিক ও

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই সাবজেক্টিভ/অবজেক্টিভ বিভাজন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জৈবিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করে। জীববিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার পূর্বশর্ত হয়ে উঠে। তাই জৈবিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, উপধারা খাঁটি বিজ্ঞানের অনুসারী হিসেবে প্রশ্নহীন রয়ে যায়। উপরের আলোচনায় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে বিজ্ঞানের মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা বা বিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠতার ধারণাটি আর প্রশ্নহীন নয়। বিজ্ঞানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এ প্রসঙ্গে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে জীববিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশে এর সামাজিক প্রেক্ষিত অনুসন্ধান, যা জৈবিক নৃবিজ্ঞানের পুনর্পাঠকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

৩.১. মানববৈচিত্র্য অনুসন্ধানের ইতিহাস

জীববিজ্ঞানের ইতিহাস ইউরোপীয় অন্যান্য জ্ঞানতাত্ত্বিক ইতিহাসের সাথে অবিচ্ছেদ্য নয়। প্রাচ্যে জীববিজ্ঞানের বিকাশ প্রাচুর্য্যময় হলেও তা ইউরোপীয় জ্ঞানের আসনে কখনও গুরুত্ব পায়নি। যেন ইউরোপ হতেই সমস্ত জ্ঞানের সূত্রপাত। কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এর সময় হতেই জ্ঞানের সাথে ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধ সত্ত্বেও বিজ্ঞানের চর্চাকে এর সামাজিক প্রেক্ষিত হতে বিচ্ছিন্ন রাখার বাহ্যিক প্রবণতা বিরাজমান ছিল। জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক চর্চা শুরু হয় জীবজগতের তালিকা এবং নামকরণের মধ্য দিয়ে। জীবজগতের শ্রেণিকরণ এবং মানুষকে মানুষের বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করার সাথে সাথেই যে সমস্যা আবির্ভুত হয় তা হল ইউরোপীয় সাদা মানুষ হতে ভিন্ন ধরনের মানুষকে এই শ্রেণিকরণে ফেলা। আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকার কালো বা মধ্যপ্রাচ্যে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সাথে সংযোগে এই বিপদের সৃষ্টি হয়। ভিন্ন মানুষকে মানুষের বর্গে ফেলতে গিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব চারশ শতকেই মাটি, বায়ু এবং স্থানের প্রভাব দ্বারা হিপোক্রেটাস মানুষের শারীরিক ও মানসিক ভিন্নতার বর্গ তৈরি করেন। জৈবিক নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের বহু পূর্বেই মানব বৈচিত্র্য অধ্যয়ন জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। খ্রিষ্টীয় একশ শতকে প্লাইনির 'প্রাকৃতিক ইতিহাসে' যে বর্ণের ক্যাটেগরী করা হয় তাদের কারো বুকের মধ্যে মুখ, কেউ আবার এক পা-ওয়ালা আবার কারো মাথা কুকুরের মতো কিন্তু দেহ মানুষের (স্টকিং ১৯৮৮)। দানবীয় এই বর্ণগুলো ঈশ্বরের অভিশাপে, না ইচ্ছায় তা নিয়ে বিতর্ক চলে। বিতর্ক হয় আদমের দুই সন্তান যারা বিপথগামী হয়েছিল তাদের এরা তাদের বংশধারা নাকি পরিবেশ ও সংস্কৃতির ফলাফল? কলম্বাসের 'আমেরিকা আবিষ্কারের' মাধ্যমে কিম্ভুত মানব বর্ণের অস্তিত্ব নাকচ হয়ে গেলেও খ্রিষ্টীয় বিশ্লেষণে মানব বৈচিত্র একটি বড় সমস্যা হিসেবে বহাল থাকে। খ্রিষ্টীয় একউৎসবাদী (monogenesis) ধারা নীতি হিসেবে সকল মানুষের একক উৎস স্বীকার করে নেয়, তাই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় আদমের তিন বংশধারার কে কোন অঞ্চলে গিয়ে কিভাবে বিপথগামী হয় তা এধারার কেন্দ্রীয় আগ্রহে পরিণত হয়। লিনিয়াসের শ্রেণীকরণে মানব বৈচিত্র শুধুমাত্র শারীরিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক/মানসিক বৈশিষ্ট্য দিয়েও বিশ্লেষিত হয়, যেমন (ব্রোবার্ক ১৯৮৩)। পরবর্তী শতকে প্রভাব বিস্তারকারী তুলমূলক শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি ব্লুমেনবাখের পাঁচ বর্ণের শ্রেণীকরণেও বাইবেলিয় প্রভাব লক্ষণীয় (স্টকিং ১৯৮৮)।

ষোল এবং সতেরো শতকে এসে বহুউৎসবাদী (polygenesis) ধারণা শক্তিশালী হয়ে উঠে, যেখানে মনে করা হয় সকল মানবসন্তান আদমের বংশোদ্ভূত নয়। এই ধারা খ্রিষ্টীয় বিশ্লেষণের সাথে বিরোধিতার জন্ম দেয় এক অর্থে, আবার অন্যদিকে এটি মানববৈচিত্র্যকে প্রজাতিগত ভিন্নতা হিসেবে তুলে ধরে যাদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ও বংশবিস্তার অপ্রাকৃতিক ও পরিত্যাজ্য (পূর্বোক্ত)। একভাবে মানববৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় একউৎসবাদী ধারা আদমের বংশধর হিসেবে সকলকেই মানুষ হিসেবে মানতে বাধ্য করে যদিও বহুউৎসবাদে এই চাপ থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় উভয়ধারাতেই ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদ বেশ শক্তিশালীভাবেই বিদ্যমান। মানববৈচিত্র্য নিয়ে এসব বিশ্লেষণের সমান্তরালে সতেরো শতকে বর্ণবাদ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের মতাদর্শিক হাতিয়ার হয়ে উঠে। বর্ণবাদের রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠে মানববৈচিত্র্য অধ্যয়ণের বৈজ্ঞানিক আকাঙ্খা। মানববৈচিত্র্য অধ্যয়ণের ইতিহাস তাই কোনোভাবেই অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ ছিল না।

৩.২. বিবর্তনবাদের গল্পকথা

ইউরোপীয় জ্ঞানজগতে যখন মানববৈচিত্র ধর্ম ও ইউরোকেন্দ্রীকতার দ্বিমুখী বলয়ে বিশ্লেষিত হতে থাকে তারই সমান্তরালে ডারইউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ইউরোপীয় জ্ঞানজগতে ঝড় তোলে। মানুষের উৎস অনুসন্ধানের পথ ধরেই জীবজগতের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডারউইন প্রজাতির টিকে থাকার এবং বিবর্তনের সূত্র খুঁজেন যা তৎকালীন জ্ঞানতাত্ত্বিক ইতিহাসে গ্রথিত। তার বিবর্তনবাদী তত্ত্বের বহু পূর্ব হতেই প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা ও স্থিরতা নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। চালর্স ডারউইনের দাদা কাব্যিক পরিবেশনে বিবর্তনবাদী চিন্তার সাথে পরিচিত করিয়ে দেন যা তাকে একভাবে প্রভাবিত করে। ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) প্রজাতির শ্রেণিকরণের মধ্য দিয়ে স্থির জীববিন্যাসের চিত্র আঁকলেও বিবর্তনের কাঠামোকে বুঝতে এই শ্রেণীকরণ ডারউইনের কাজেই আসে। লিনিয়াসের স্থিরতার বিপরীতে বাফোন (১৭০৭-১৭৮৮) জীবজগতের প্রবাহমানতার পক্ষে থাকেন। পাশাপাশি ল্যামার্ক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন প্রজাতির জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য দিয়ে যা ব্যাপক সমর্থিত না হলেও অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা বজায় রাখে। অন্যদিকে কুভিয়ের (১৭৬৮-১৮৩২) বিবর্তনবাদী ক্রমপরিবর্তনকে খারিজ করে দেন মহাপ্রলয়বাদী (catastrophism) তত্ত্ব দিয়ে। এই তত্ত্বমতে মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে পুরোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি আসে। ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার সমসাময়িক বিদ্যমান যুক্তিগুলোকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র দিয়ে গাঁথেন। ডারউইন ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে প্রজাতির বংশবৃদ্ধিহারের সাথে টিকে থাকার আনুপাতিক হার এবং প্রজাতির এককের মধ্যকার আকৃতিগত পার্থক্যের সূত্র ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব দেন। তার মতে বিপুল সংখ্যক প্রাণীর জন্ম সত্ত্বেও কিছুসংখ্যকই শুধু টিকে থাকে, যার কারণ যোগ্যতম প্রজাতির প্রাকৃতিক নির্বাচন। ওয়াইজম্যান এই মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনই জৈবিক বিবর্তনের একমাত্র কারণ এবং এখানে একমাত্র জন্মগতভাবে প্রাপ্ত সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোই পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়, এক্ষেত্রে ল্যামার্কিয়ান অর্জিত

বৈশিষ্ট্য বংশধারায় প্রবাহের ধারণা বাতিল হয়। ডারউইন তার শেষের লেখায় মানব বিবর্তনে যৌনতার নির্বাচনবাদের উপর গুরুত্ব দেন। ধর্মকে আক্রমণ করার জন্য ডারউইনের কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও তার আলোচনা একেশ্বরবাদীদের অবস্থানকে অবজ্ঞা করে। স্পেন্সার সামাজিক বিশ্লেষণে যেভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাকে জনপ্রিয় করেন, তাতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম রয়েছে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্রিটেনে একেশ্বরবাদীরা অস্থায়ী সাফল্য পায় (সুলতানা ও ইসলাম। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির টিকে থাকা বা বিলুপ্ত হওয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও প্রজাতির বিবর্তন বা পরিবর্তন ব্যাখা করতে পারে না। এমনকি প্রজাতির বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও এই বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যাতীত থেকেই যায়।

গ্রেগর মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্ব প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যাতীত অংশগুলোর এক ধরনের পথের সন্ধান দেন। জীনতত্ত্ব হতে জানা যায় প্রকট বৈশিষ্ট্য ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা, জানতে পারি যে, প্রকট (ডারউইন যাকে অধিকতর যোগ্য বলবেন) বৈশিষ্ট্য প্রকাশ্য থাকার সম্ভাবনা প্রজন্মের মধ্যে বেশী থাকে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রজাতির জিন এর মধ্যে রয়ে যায় প্রকাশ্য না হলেও। জিনতত্ত্বের নতুন প্রাপ্তি হতে জীববিজ্ঞানের জিনগত গবেষণা অনেকদূর এগিয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে প্রাণীদেহের সমস্ত সমস্যা জিন কোডের ডি. এন. এ. তে লিখিত হিসেবে আবিষ্কৃত হয়। জীববিজ্ঞানের এই বৈপ্লবিক আবিষ্কার হতে আনুমানিক বিভিন্ন কারণে মানবদেহের ডি.এন.এ কোডে পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত বিপর্যয়কে বিবর্তন ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা শুরু হয়।

জীবজ্ঞিানের এই অভিনব আবিষ্কার বিবর্তন শুধু নয়, বরং জীববিজ্ঞানকেই একটি নতুন মোড় এনে দেয়। এ পর্যায়ে এসে জীবরহস্য ডি.এন.এ কোডে পড়বার যোগ্য টেক্সট হিসেবে আবির্ভূত হয়। জেনেটিক এবং জীববিজ্ঞান এ পর্যায়ে একভাবে ভাষাগত মোড় নেয়, ঠিক যেভাবে সস্যুঘের ভাষাতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত লেভিস্ট্রোস সংস্কৃতিকে ভাষার মত করে পাঠ করতে চান। কাঠামোবাদী ভাষাতত্ত্ব হতে এগিয়ে গিয়ে যেভাবে রোলাঁ বার্থ ও অন্যান্য চিহ্নবিদ মানব আচরণকে পাঠ করতে চান (চালর্সওয়ার্থ, ফ্যারেল, স্টকস, টার্নবুল : ১৯৮৯)।

আলোচনার এ প্রসঙ্গে এসে হারাওয়ের গল্পকথার ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। হারাওয়ে যেভাবে সত্য ও গল্পকথার বিভাজন মুছে দিয়ে বিজ্ঞানকে গল্পকথা হিসেবে দেখেন, বিবর্তনের তাত্ত্বিক ইতিহাস আমাদের চেনা জানা যে কোনো সায়েন্স ফিকশনের মতোই প্রমাণ এবং অনুমানের সমন্বয়ে একটি গল্পকথার মালা হয়ে উঠে। আর জীববিজ্ঞানের নব্য আবিস্কৃত এই ডি.এন.এ টেক্সটকে ঘিরে আরো চমকপ্রদ হয়ে উঠতে দেখা যায় এই গল্পকাহিনীকে।

৪. জৈবিক নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক উপধারা

মানববৈচিত্র্য এবং মানব বিবর্তন আলোচনায় জৈবিক নৃবিজ্ঞানের যে দুটো উপধারা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করেছে তা হলো প্যালিওএ্যানথ্রোপলজী এবং প্রাইমেটোলজী।

মানব বিবর্তন এবং মানুষের জৈবিক বিশ্লেষণ বুঝতে মাটির নীচে জীবাশ্মে পরিণত হওয়া মানুষের পুর্বপুরুষের হাড়গোড় বিশ্লেণের বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গড়ে উঠে প্যালিওএ্যানথ্রোপলজী। আর জীবিত প্রাইমেটদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষকে বুঝতে, এর সীমানা নির্ধারণ করতে চায় প্রাইমেটলজী।

৪.১. জীবাশ্মমালার গল্পকথা

মাটি খুঁড়ে জীবাশ্মে পরিণত হওয়া মানুষের বা তার নিকটবর্তী প্রজাতির হাড়গোড় বা ব্যবহার্য জিনিষপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিবর্তন, তার মানুষ হয়ে উঠা, তার বিবর্তনের কুলুজি নির্ণয় প্যালিওএ্যানথ্রোপলজীর কাজ। এই কাজে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বোঝার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে প্রাকৃতিক নয়, মানুষ দ্বারা কোনো না কোনোভাবে নির্মিত বা রূপান্তরিত হাতিয়ার গবেষণার বিষয় হয়ে উঠে। কাঠ বা হাড়ের তৈরি হাতিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যে জ্ঞানজাগতিক পূর্বানুমান হতে হাতিয়ার নির্মাণ এবং তার সাথে সম্পৃক্ত লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনের ধারণা সভ্যতার সূচনাবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয় তাকে প্রশ্ন করেন স্যালী লিনটন (উদ্ধৃত হারাওয়ে পৃ:৩৩৪)। তিনি মানব বিবর্তনে 'প্রথম হাতিয়ার' এর ধারণাকে মতাদর্শিক এবং কাল্পনিক হিসেবে সমালোচনা করেন এবং হাতিয়ার-কেন্দ্রীকতাকে পশ্চিমা পুরুষালি প্রযুক্তিবাদী চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন হিসেবে তুলে ধরেন। এর বিপরীতে সভ্যতার সূচনা বুঝতে তিনি হাতিয়ার নয় বরং সাংস্কৃতিক আবিষ্কারের প্রতি গুরুত্ব দেন। যার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো একই সাথে হাতে শিশুসন্তান বহন করার পাশাপাশি খাদ্যসংগ্রহ করতে থাকার দক্ষতা। (১৯৭৫ :৫৬)। তার এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদের মধ্য দিয়ে 'ম্যান দ্য হান্টার' এর গুরুত্ব 'উইমেন দ্য গ্যাদারার' দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য হয়ে উঠে। এমনকি দাঁতের বির্বতন যখন খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন শিকার হতে প্রাপ্ত মাংস মানুষের খাদ্যতালিকায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ডাহলবার্গ দেখান যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উদ্ভিজ্জ উৎস হতে সংগৃহীত খাদ্যই জীবনধারণে বড় ভূমিকা রাখে (ডাহলবার্গ ১৯৮৩)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতার বিবর্তনে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন, পুরুষের হাতিয়ার উদ্ভাবন বা শিকারের গুরুত্ব লিঙ্গবাদী আগ্রহ হিসেবে প্রশ্নের মুখে পড়ে। মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত জীবাশ্ম বিশ্লেষণে প্যালিওএ্যানথ্রোপলজীর প্রাপ্ত তথ্য একেকটি বিচ্ছিন্ন পুঁতির মত হয়ে উঠে যা দিয়ে সাজানো হয় মানব বিবর্তনের ফিকশনের মালা। এই ঐতিহাসিক পুনঃনির্মাণ একটি নিরন্তর বদলাতে থাকা, বিতর্কের সৃষ্টি করা একটি গল্পকথা-ক্ষেত্র হয়ে উঠে।

৪.২. প্রাইমেট কল্পকাহিনী

মানুষ ও তার আচরণ অনুসন্ধানের একটি বড় সমাধান হিসেবে হাজির হয় প্রাইমেটলজী। মানুষ নয় এমন প্রাইমেট বিশ্লেষণের পেছনে তাই দুটি প্রধান তাগিদ কাজ করে। প্রথমতঃ মানুষের আচরনগত ব্যাখ্যার একটি সম্ভাব্য উৎস খোঁজার তাগিদ। দ্বিতীয়তঃ মানুষের সাথে

মানুষ নয় এমন প্রাইমেটের পার্থক্য দ্বারা মানুষের সংজ্ঞায়ন ও সীমানা খোঁজার চেষ্টা (নেলসন : ১৯৮৮)। এই দুই আগ্রহ কিন্তু দ্বন্দ্বময় মনে হতে পারে, কিন্তু এই দুইয়ের মাধ্যমে প্রাইমেটদের সাথে তুলনার মধ্য দিয়ে মানুষের কি প্রাকৃতিক আর কি সাংস্কৃতিক তার সীমানা তৈরির চেষ্টা করা হয়। হারাওয়ের মতে প্রাইমেটলজী পশ্চিমা দ্বিবিভাজনের দেয়ালকে আরো শক্তপোক্তভাবে নির্মাণের ক্ষেত্র হয়ে উঠে। তার মতে মানুষ নিজকে নিয়ে যেসব অসমাপ্ত প্রশ্নের কাম্য উত্তর পেতে চায় তারই হাতিয়ার হয়ে উঠে প্রাইমেটলজী যাতে গাঁথা হয় বর্ণ, যৌনতা, লিঙ্গ, জাতি, পরিবার, শ্রেণিকেন্দ্রিক পশ্চিমা ধারণা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ডোনা হারাওয়ে গল্পকাহিনী হিসেবে বিজ্ঞানকে তুলে ধরেন। বিশেষতঃ প্রাইমেটলজী আলোচনায় তিনি তার যুক্তিকে বিস্তারিত করে উপস্থাপন করেন। কেননা, প্রথমত যে বৈজ্ঞানিক পাটাতনে এর বিকাশ, সেই জীববিজ্ঞান ঐতিহাসিক, উনিশ শতকে এটি প্রাণের জীবনকাহিনী হিসেবে গ্রন্থিত হয়। এই গল্পকাহিনীতে চর্চায় বিজ্ঞানী এবং প্রাণ উভয়েই কর্তা হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে (হারাওয়ে : ১৯৮৯ পৃ:৫)। দ্বিতীয়তঃ প্রাইমেটলজীর মধ্যদিয়ে যে গল্প উৎপাদিত হয় তা প্রকৃতি/সংস্কৃতি, প্রাণী/মানুষ, শরীর/মন, উৎস/ভবিষ্যত ইত্যাদি দ্বি-বিভাজনের গল্পকথা তৈরি করতে থাকে। আর এ কারণেই ডোনা হারাওয়ে তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'প্রাইমেট ভিশন' বই এ প্রাইমেটলজীকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হিসোবে পাঠ করতে চান। ।

তিনি এই কল্পকাহিনীকে বানরের প্রাচ্যবাদ (পূর্বোক্ত ঃ পৃ:১০) হিসেবে তুলে ধরেন। এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যবাদের ধারণা ব্যবহার করে হারাওয়ে দেখান, যেভাবে পশ্চিমা জ্ঞানধারা পশ্চিমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে প্রাচ্যকে নির্মাণ করে এর বিপরীতে, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্মাণে প্রাইমেটলজী প্রাইমেট কাহিনী তৈরি করে।

৫. উপসংহার

জৈবিক নৃবিজ্ঞানের চর্চাকে খাঁটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে ধরে নিয়ে প্রশ্নাতীত রাখার যে ঐতিহ্য, বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ক্রিটিকাল সামাজিক বিশ্লেষণের বরাতে সেই ঐতিহ্যকেই ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। যার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সমালোচনার যে দার্শনিক অগ্রগতি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে ভিত্তি করে জৈবিক নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং উপধারাগুলোর একটি সূচনামূলক পর্যালোচনা এতে হাজির করা হয়েছে। জৈবিক নৃবিজ্ঞানের পাটাতন হিসেবে জীববিজ্ঞান, পরিসর হিসেবে জৈববিবর্তন এবং মানব বৈচিত্র্য এবং উপধারা হিসেবে প্যালিওএ্যানথ্রোপলজী ও প্রাইমেট অধ্যয়নের ভিত্তিমূলে প্রোথিত পশ্চিমা, পুরুষতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক আগ্রহকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে একটি বিতর্কের পাটাতন সৃষ্টি করাই ছিল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জৈবিক নৃবিজ্ঞানের অবিনির্মিত উন্মোচনের সাথে সাথেই এটি একটি বিতর্কের পরিসর সৃষ্টি করবে যার মধ্য দিয়ে নতুন প্রশ্ন, নতুন বিশ্লেষণের নিরন্তর যাত্রার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। আমি মনে করি বিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণের ধারায় বিজ্ঞানের ধ্রুবত্ব এবং আধিপত্যকে প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে যে

ক্রিটিকাল পরিসর উন্মুক্ত হয়, সেই পরিসরে এটি জৈবিক নৃবিজ্ঞান এবং এর চর্চার ইতিহাসের পুনর্পাঠের সেই পথ তৈরি করে।

তথ্যপঞ্জী

ইসলাম, মনিরুল (২০০৭) *জৈববিবর্তনবাদ: দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ*, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।

Alvares, C. (1988) Science, Colonialism and Violence: A Luddite View, in Nandy, A. (ed.) *Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity*, New York: Oxford.

Charlesworth, M. Farrall, L. Stokes, T. Turnbull, D (1889) *Life among the Scientist: An Anthropological Study of an Australian Scientific Comunity*, New York: Oxford University Press.

Haraway, D, (1991), A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century; in *Symians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. London: Free Association Books.

Haraway, D. (1989) *Primate Vision: Gender, Race, and nature in the World of Modern Science*, New York, London: Routledge.

Harding, S. (1996) Multicultural and Global Feminist Philosopies of Science: Resources and Challenges, in Nelson, L. H. and Nelson, J. (eds.) *Feminism, Science, and the Phylosophy of Science*, London: Kluwer Academic Publishers.

Nelson, H. and Jurman, R. (1988) *Introduction to Physical Anthropology*, US: West Publishing Company.

Shiva, B. (1988) Reductionist Science as Epistemological Violence, in Nandy, A. (ed.) *Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity*, New York: Oxford.

Skybreak, A. (1984) *Of Primeval Steps and Future Leaps: An Essay on the Emergence of Human beings, the sourse of Womens Oppression, and the Road to Emancipation*, Chicago: Banner Press.

Stabile, Carol (1997), Feminism and the Technological Fix, in Kemp, Sandra & Judith Squires (eds.), *Oxford Readers: Feminism*, Oxford, NewYork, Oxford University Press.

Stocking, G. W. Jr. (1988) Bones Bodies, Behaviour: Essays on Biological Anthropology, in *History of Anthropology, Vol-5*, London: The University of Wisconsin Press.

Young, R. (2006) Putting Materialism Back into Race Theory: Toward a Transformative Theory of Race, in Young, J and Braziel (eds.) *Race and the Foundations of Knowledge*, Chicago:University of Illinois Press.